জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ

(ENVIRONMENT, DISTRIBUTION AND CONSERVATION)

ইউনিট ১৪

ভূমিকা

প্রতিটি জীবের সাথে তার পরিবেশের এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সকল পরিবেশে সকল জীব প্রজাতি বাস করতে পারে না। প্রাকৃতিক অথবা মানুষের কারণে পৃথিবীতে কিছু জীব আজ বিলুপ্তির পথে। এদেরকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা চলছে। বিভিন্ন প্রকার জীব প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী, জীব সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধরনের অরণ্যে জীবের বিস্তার ও বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের বর্ণনা এ ইউনিটের আলোচ্য বিষয়।

সুন্দরবনের দুটি প্রাকৃতিক দৃশ্য

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৪.১ : প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীব সম্প্রদায়	পাঠ ১৪.৬ : উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য
পাঠ ১৪.২ : ইকোলজিক্যাল পিরামিডের প্রকারভেদ	পাঠ ১৪.৭ : উপকূলীয় এলাকায় বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা
পাঠ ১৪.৩ : জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জীবের অভিযোজন	পাঠ ১৪.৮ : বিলুপ্তপ্রায় জীব, জীব বিলুপ্তির কারণ এবং বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
পাঠ ১৪.৪ : বিভিন্ন ধরনের বায়োম	পাঠ ১৪.৯ : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি ও গুরুত্ব
পাঠ ১৪.৫ : বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং প্রধান প্রধান উদ্ভিদ	পাঠ ১৪.১০ : বিলুপ্তপ্রায় জীবের সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা

পাঠ-১৪.১ প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীব সম্প্রদায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীব সম্প্রদায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীব সম্প্রদায়

প্রজাতি (Species) : প্রজাতি বলতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক মিল সম্পন্ন একদল জীবকে বোঝায়। যেমন- আম গাছগুলো একত্রে আম প্রজাতি (*Mangifera indica*) গঠন করে। বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্ট অনুযায়ী একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত দুটি জীব তাদের মধ্যে যৌন মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দুটি মিলসম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রস করে উর্বর সন্তান উৎপাদনের পরীক্ষা করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার বলে শ্রেণিবিন্যাসবিদগণ কেবল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রজাতি নির্ণয় করতে চান। প্রজাতি নির্ণয়ে জীবের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নেয়া হয়। যেমন- পরাগরেণু, ক্রোমোসোম, ডিএনএ (DNA), আরএনএ (RNA) ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য।

প্রজাতির বৈশিষ্ট্য : প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেয়া হলো-

১। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক মিলসম্পন্ন একদল জীব,

২। একই প্রজাতিভুক্ত জীব একটির সাথে অপরটি ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদন করতে পারে কিন্তু অন্য প্রজাতিভুক্ত কোন জীবের সাথে ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।

৩। একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকলে তা হবে নিরবিচ্ছিন্ন।

৪। একই প্রজাতিভুক্ত জীবসমূহ একই পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভুত।

জীবগোষ্ঠী (Population) : একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে জীবগোষ্ঠী বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী ও সম্মিলিতভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল সব প্রজাতির সব জীবগোষ্ঠী মিলে গঠন করে একটি **জীব সম্প্রদায়**। সব জীবের সব জীব সম্প্রদায় মিলিতভাবে তৈরি করে **জীবমন্ডল**।

জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য : জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেয়া হলো-

১। **ঘনত্ব বা বিস্তার-** একক সময়ে একটি একক আয়তনে কোন প্রজাতির কতটি সদস্য আছে তা হলো পপুলেশনের ঘনত্ব। যে কোনো প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর ঘনত্ব ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন হয়। আবার একই অবস্থানের বিভিন্ন ঋতুতে বা ভিন্ন ভিন্ন বছরে কোন প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর ঘনত্ব ভিন্নতর হয়। কোন জীবগোষ্ঠী বণ্টনের ভৌগোলিক বিস্তারের সীমাকে বলা হয় ঐ জীবগোষ্ঠীর বিস্তার পরিসর। বিস্তার পরিসরে কোন প্রজাতির বিস্তার সমপ্রকৃতির হয়, অসমপ্রকৃতির হয় আবার গুচ্ছাকারও হয়।

২। **জন্ম ও মৃত্যুহার-** প্রতিটি জীবগোষ্ঠীর জন্ম ও মৃত্যুহার থাকে। সময়ের সাথে জীবগোষ্ঠীর পরিবর্তন হয়, পৃথিবীর অঞ্চলভেদেও এ পরিবর্তন হয়। জন্ম ও মৃত্যুর কারণে এ ধরনের পরিবর্তন হয়। জন্ম ও মৃত্যু হার সমান হলে জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধি শূন্য হয়।

৩। **সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি-** প্রতিটি জীবগোষ্ঠীর একটি প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি থাকে। সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিবেশে কোন পপুলেশন সর্বাধিক কতটা বৃদ্ধি পেতে পারে তাকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি। বিভিন্ন প্রজাতির এ বর্ধনশক্তি ভিন্নতর হয়। দেখা গেছে একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ দশ ঘণ্টায় সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭,৩৭,৪১,৮২৪ টি হয়। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যাবৃদ্ধির শক্তি তুলনামুলকভাবে অনেক কম।

৪। **সীমিতকরণ শক্তি-** প্রকৃতিই জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধিকে সীমিত রাখে। কাজেই কোন জীবগোষ্ঠী তার প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি ও শক্তিকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজে লাগাতে পারে না। পরিবেশীয় প্রভাবকসমূহ জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধিকে সীমিত রাখে। বিবর্তনের কার্যক্রম জীবগোষ্ঠীতেই আরম্ভ হয়।

পরিবেশীয় নিয়ামক যেমন- তাপ, আলো, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো প্রভাবিত করে।

জীব সম্প্রদায় (Biotic Community) : জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একই পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের প্রাকৃতিক সমাবেশ যেখানে প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি সহনশীল, নির্ভরশীল এবং পরস্পর ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট স্থানে জীবসমূহের সমষ্টিগত অবস্থানকে জীব সম্প্রদায় বলা হয়। একটি বড় মরুভূমি বা তৃণভূমির যেমনি নির্দিষ্ট জীব সম্প্রদায় থাকে, তেমনি আবার ছোট একটি ডোবারও একটি জীব সম্প্রদায় থাকে। একই বসতিতে বিরাজমান উদ্ভিদ সম্প্রদায় এবং প্রাণী সম্প্রদায় একত্রে জীব সম্প্রদায় গঠন করে। জীব সম্প্রদায়ের সাথে এদের পরিবেশ মিলে ইকোসিস্টেম তৈরি হয়।

জীব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য : জীব সম্প্রদায়ে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা-

প্রজাতির বিভিন্নতা- একটি জীব সম্প্রদায়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতি বসবাস করায় প্রজাতি বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এটা বেশ সমৃদ্ধ।

বৃদ্ধির ধরন ও গঠন- একটি জীব সম্প্রদায়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবের বৃদ্ধি, ধরন ও গঠন বিভিন্ন রকম হয়। যথা- উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বৃক্ষ, গুল্ম, তৃণ, মস ইত্যাদি। এসব পর্যায় সম্প্রদায়ে উল্লম্ব স্তরায়নের সৃষ্টি করে।

আধিপত্য- জীব সম্প্রদায়ের প্রকৃতি নির্ণয়ে সম্প্রদায়ভুক্ত সব প্রজাতি সমান ভূমিকা পালন করে না। সম্প্রদায়র্ভুক্ত বহু প্রজাতির মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি এদের সংখ্যা, আকার ও অন্যান্য কর্মকান্ড দ্বারা পুরো সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

স্তরবিন্যাস- প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের অবস্থান অনুসারে লম্বালম্বি স্তরবিন্যাস থাকে। যথা- একটি বন সম্প্রদায়ে ওভারস্টোরি স্তর, আন্ডারস্টোরি স্তর, ট্রান্সগ্রেসিভ স্তর, চারা স্তর এবং ভূসংলগ্ন স্তর দেখা যায়।

ক্রমাগমন- সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমাগমন একটি চলমান প্রক্রিয়া। কারণ প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ক্রমবিকাশ বা ধারা রয়েছে।

খাদ্য স্তর গঠন ও পুষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণতা- একটি সম্প্রদায়ভূক্ত জীব প্রজাতিসমূহের মধ্যে একটি খাদ্য শৃঙ্খল ও একটি শক্তি প্রবাহ নিশ্চিত হয়। এতে উৎপাদনকারী, তৃণভোজী, মাংসভোজী, পঁচনকারী সব ধরনের জীবেরই সমাবেশ ঘটে।

সময়ের সাথে সম্প্রদায়ের পরিবর্তন- সময় ও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সম্প্রদায়ভূক্ত জীব প্রজাতিরও পরিবর্তন হয়। তাই বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জীব প্রজাতির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীত, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে এ পরিবর্তন লক্ষণীয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে জীবগোষ্ঠী এবং জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখুন
জীবগোষ্ঠী	জীব সম্প্রদায়

সারসংক্ষেপ

প্রজাতি বলতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক মিল সম্পন্ন একদল জীবকে (উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব, ছত্রাক ইত্যাদি) বোঝানো হয় যারা তাদের মধ্যে যৌন মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে বলা হয় জীবগোষ্ঠী। জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একই পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের প্রাকৃতিক সমাবেশ যেখানে প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি সহনশীল, নির্ভরশীল এবং পরস্পর ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট স্থানে জীবসমূহের সমষ্টিগত অবস্থানকে জীব সম্প্রদায় বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যে মিলসম্পন্ন একদল জীব যাদের মধ্যে অবাধ যৌন মিলনে উর্বর বংশধর উৎপন্ন হয় তাদেরকে বলা হয়-

(ক) গণ (খ) প্রজাতি (গ) পপুলেশন (ঘ) সম্প্রদায়

পাঠ-১৪.২ ইকোলজিক্যাল পিরামিডের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইকোলজিক্যাল পিরামিড সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ইকোলজিক্যাল পিরামিড এর প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	সংখ্যার পিরামিড, জীবভরের পিরামিড, শক্তির পিরামিড

ইকোলজিক্যাল পিরামিড : বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের খাদ্য শৃঙ্খলের বিন্যাস সম্পর্কিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে। সাধারণত একটি ইকোসিস্টেমে উৎপাদকের তুলনায় প্রাথমিক খাদকের সংখ্যা কম থাকে। আবার প্রাথমিক খাদকের তুলনায় সেকেন্ডারি খাদকের সংখ্যা কম থাকে। সেকেন্ডারি খাদকের তুলনায় টারসিয়ারি খাদকের সংখ্যা আরও কম থাকে। খাদ্য স্তরগুলোর মধ্যকার এরূপ সম্পর্ক নিয়ে নকশা আঁকলে একটি পিরামিডের ন্যায় চিত্র পাওয়া যাবে।

চিত্র ১৪.২.১ : সংখ্যার পিরামিড

প্রকারভেদ- ইকোলজিক্যাল পিরামিড সাধারণত তিন প্রকারের হয়। যথা- ১। সংখ্যার পিরামিড, ২। জীব ভরের পিরামিড এবং ৩। শক্তির পিরামিড।

১। সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of numbers) : এতে প্রত্যেক ফুড চেইনের প্রথম খাদ্যস্তরের জীবের সংখ্যা শেষ খাদ্য স্তরের জীবের সংখ্যার তুলনায় বেশি। ফুড চেইনের খাদ্যস্তরের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক দেখানোর জন্য সৃষ্ট পিরামিড আকৃতির লৈখিক অঙ্কনকে সংখ্যার পিরামিড বলা হয়।

এতে দেখা যায় ফুড চেইনের শুরুতে খাদ্য স্তরে উদ্ভিদ অবস্থিত এবং এদের সংখ্যা অনেক বেশি। দ্বিতীয় খাদ্য স্তরে প্রাণীর সংখ্যা (ফড়িং) প্রথম স্তরের উদ্ভিদের সংখ্যা হতে কম। তেমনি ৩য় স্তরের জীবের (ব্যাঙ) সংখ্যা ২য় স্তরের সংখ্যা হতে কম। অর্থাৎ প্রতি স্তরে জীবের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং একটি ত্রিকোণাকৃতির পিরামিডের আকার ধারণ করছে।

২। জীবভরের পিরামিড (Pyramid of Biomass) : কোন পরিবেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ে জীবের শুকনা ওজনকে জীবভর (Biomass) বলে। কোন একটি ফুড চেইনের খাদ্যস্তরগুলোর জৈবিক ওজন নেয়া হয় এবং এদের ফলাফল দ্বারা লৈখিক চিত্র অঙ্কন করলে এটাকে পিরামিডের ন্যায় দেখায়। একেই জীব ভরের পিরামিড বলে। চিত্রে দেখা যায় একটি উদ্ভিদের জৈবিক ওজন উহার উপর নির্ভরশীল পাখিদের ওজন হতে অনেক বেশি। পাখিদের ওজন উহাদের উপর নির্ভরশীল পরজীবী পোকামাকড়ের ওজনের চেয়ে বেশি। যদিও পোকামাকড়ের সংখ্যা অনেক।

চিত্র ১৪.২.২ : জীবভরের পিরামিড

৩। শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy) : যে কোনো ইকোসিস্টেমে একটা ফুড চেইনের বিভিন্ন খাদ্য স্তরে বিশেষ সময়ে শক্তি নির্ণয় করে লৈখিক চিত্র অঙ্কন করা যায় এবং এটা পিরামিডের আকার ধারণ করে। এটাকে শক্তির পিরামিড বলা হয়। একটি বিশেষ এলাকার উদ্ভিদ নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করতে পারে তা একই সময়ে অন্যান্য খাদ্য স্তরের ঐ এলাকার জীবসমূহ যে পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে তা থেকে অনেক বেশি। একটি পুকুরের শক্তির পিরামিড দেখানো হলো- পুকুরে ফাইটোপ্লাঙ্কটনের সংখ্যা অত্যাধিক এবং এদের জীবনচক্র অতি অল্প সময়ে শেষ হয় বলে দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে। ঘাস যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে পারে তা অল্প সংখ্যক ঘাসফড়িংয়ের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশি। আবার ঘাসফড়িং যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে পারে তা ৩য় স্তরের ব্যাঙের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশি। ৩য় খাদ্য স্তরের ব্যাঙের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা ৪র্থ স্তরের সাপের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশি। এভাবে ৪র্থ খাদ্য স্তরের সাপের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা ৫ম স্তরের মাংসভোজী প্রাণী ঈগলের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশি।

চিত্র ১৪.২.৩ : শক্তির পিরামিড

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে বিভিন্ন প্রকার পিরামিডের পার্থক্য লিখুন	

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের খাদ্য শৃঙ্খলের বিন্যাস সম্পর্কিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলা হয়। ইকোলজিক্যাল পিরামিড সাধারণত তিন প্রকারের হয়। যথা- ১। সংখ্যার পিরামিড, ২। জীবভরের পিরামিড এবং ৩। শক্তির পিরামিড। ফুড চেইনের খাদ্যস্তরের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক দেখানোর জন্য সৃষ্ট পিরামিড আকৃতির লৈখিক অঙ্কনকে সংখ্যার পিরামিড বলা হয়। কোন পরিবেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ে জীবের শুকনা ওজনকে জৈবিক ওজন বলে। কোন একটি ফুড চেইনের খাদ্যস্তরগুলোর জৈবিক ওজন নেয়া হয় এবং এদের ফলাফল দ্বারা লৈখিক চিত্র অঙ্কন করলে এটাকে পিরামিডের ন্যায় দেখায়। একেই জৈবিক ওজনের পিরামিড বলে। যে কোনো ইকোসিস্টেমে একটা ফুড চেইনের বিভিন্ন খাদ্য স্তরে বিশেষ সময়ে শক্তি নির্ণয় করে লৈখিক চিত্র অঙ্কন করা যায় এবং এটা পিরামিডের আকার ধারণ করে। এটাকে শক্তির পিরামিড বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ইকোলজিক্যাল পিরামিডের ভূমিতে কোনটি থাকে ?

(ক) উৎপাদক (খ) প্রাথমিক খাদক (গ) গৌণ খাদক (ঘ) টারশিয়ারি খাদক

২। ইকোলজিক্যাল পিরামিডের মধ্যে আছে-

i. সংখ্যার পিরামিড ii. শক্তির পিরামিড iii. বায়োমাস পিরামিড

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৩ জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জীবের অভিযোজন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবের অভিযোজন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণী) অভিযোজন বর্ণনা করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	**অভিযোজন, জলজ, মরুজ, লবণাক্ত পরিবেশ**

জীবের অভিযোজন : পরিবেশের সাথে জীবের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পৃথিবীর সব স্থানের পরিবেশ এক রকম নয়। তাই সব স্থানে সব ধরনের জীব বাস করতে পারে না। প্রতিটি জীব তখনই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে যখন সে তার সুবিধা মত একটি অনুকূল পরিবেশ পায়। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে কোন জীবের খাপ খাইয়ে নেয়াটাই হলো ঐ জীবের অভিযোজন। বাসস্থানের ধরনের উপর ভিত্তি করে জীবগুলো জলজ, স্থলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশের হয়। এক এক পরিবেশে বসবাসরত জীবের মধ্যে ঐ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এগুলোই তাদের অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য।

জলজ পরিবেশের অভিযোজন : যে সব উদ্ভিদ পানিতে জন্মায় তাদেরকে জলজ উদ্ভিদ বলে। এরা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত, ভাসমান বা উভচর হতে পারে। যেমন- হাইড্রিলা, পাতা শেওলা, পাতা ঝাঁঝি, টোপাপানা, মাখনা, পানিকলা, পদ্ম, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ।

জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের কান্ড নরম, দুর্বল, সরু ও লম্বা পর্ব মধ্যবিশিষ্ট হয়। মাটিতে নোঙ্গরাবদ্ধ ভাসমান উদ্ভিদের কান্ড সাধারণত রাইজোম জাতীয় হয়।

২। জলজ উদ্ভিদের মূল সুগঠিত হয় না, অনেক সময় মূল থাকে না বললেই চলে।

৩। কান্ড ও পাতার বহিঃত্বক কিউটিনযুক্ত থাকে না। পত্ররন্ধ্র থাকে না বা সংখ্যায় কম থাকে। পত্ররন্ধ্রে প্রহরীকোষ নাও থাকতে পারে।

৪। এদের মূল ও কান্ডে বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে।

৫। জলজ উদ্ভিদের ভাস্কুলার বান্ডল অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে, অনেক সময় জাইলেম অনুপস্থিত থাকে। মেকানিক্যাল টিস্যু খুবই কম থাকে, তাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব শক্ত হয় না।

৬। অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদে অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে।

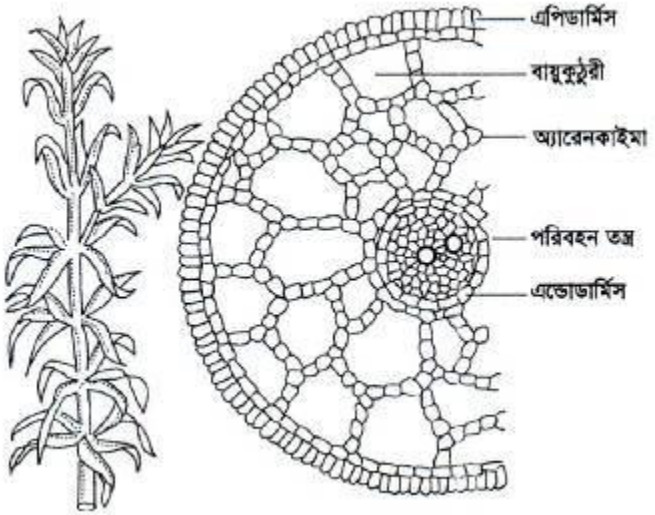

চিত্র ১৪.৩.১ : *Hydrilla verticillata* (একটি জলজ উদ্ভিদ) (ক) বাহ্যিক গঠন, (খ) কান্ডের অন্তর্গঠন

জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন

১। জলজ উদ্ভিদের কান্ড ও পাতায় কিউটিকল না থাকায় সমস্ত দৈহিক অঙ্গের মাধ্যমে পানি শোষণ করতে পারে। কাজেই সুগঠিত মূল ও মূলরোমের দরকার হয় না। আবার স্বল্প মূল বা মূল একেবারে না থাকা এদের জন্য অসুবিধা হয় না।

২। মেকানিক্যাল টিস্যু না থাকায় কান্ড ও পাতা নরম থাকে। ফলে প্রবাহমান পানির টান বা জলজ প্রাণীর চলাচলে কোন প্রকার বাঁধার সৃষ্টি হয় না এবং ভেঙ্গেও যায় না।

৩। দেহের সব অঙ্গ দিয়ে পানি শোষণ করতে পারে। ফলে সুগঠিত পরিবহনতন্ত্রের দরকার হয় না।

৪। জলজ পরিবেশের কান্ড ও পাতার বহিঃত্বকেও ক্লোরোপ□াস্ট থাকে। ফলে পানির নিচে কম আলোতে ও কম কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত পরিবেশেও দরকারী খাদ্য তৈরি করতে পারে।

৫। জলজ উদ্ভিদের কান্ডে বড় বড় বায়ুকুঠুরি থাকায় ভাসমান জলজ উদ্ভিদ সহজেই ভাসতে পারে। অন্যদিকে বায়ুকুঠুরীতে বায়ু জমা থাকায় শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষণে অসুবিধা হয় না।

৬। সমগ্র দৈহিক অঙ্গে পানি শোষণের ব্যবস্থা থাকায় এদের প্রস্বেদনের দরকার হয় না। ফলে কম পত্ররন্ধ্র থাকলেও এদের পানির কোনই অসুবিধা হয় না। পানির অপচয় দরকার হয় না বলে প্রহরী কোষবিহীন পত্ররন্ধ্রে এদের অসুবিধা হয় না।

৭। জলজ উদ্ভিদের পরাগায়ন কিছুটা অনিশ্চিত বিধায় এদের অধিকাংশই অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করে।

জলজ প্রাণীর অভিযোজন

জলজ প্রাণীরা জলে বাস করতেই বিশেষভাবে অভিযোজিত। জলজ প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশই হলো মাছের বিভিন্ন প্রজাতি। পানিতে থাকার সুবিধার জন্য এদের দেহের ভেতরে পটকা নামক বায়ুথলি থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ফুলকা থাকে। পানিতে চলাচলের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাখনা থাকে। দেহের মাকু আকৃতি ভারসাম্য রক্ষা ও সাতার কাটার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ব্যাঙ, কাছিম, কুমির, সাপ এগুলোও পানিতে বাস করতে পারে। এদের দেহের বিশেষ গড়ন, লোমহীন পুরু ত্বক, পা বা লেজ দিয়ে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা এবং পানির নিচে অক্সিজেন গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে।

মরুজ পরিবেশে অভিযোজন

যে সকল জীব পরিবেশের পানির অভাব সাফল্যের সাথে মেনে নিতে পারে এবং শুষ্কতা ও অধিক তাপমাত্রাকে আয়ত্ত্ব করার জন্য নিজেদের দেহের অঙ্গসংস্থানিক অভ্যন্তরীণ ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে বাস করতে পারে তাদেরকে মরুজ জীব বলে। মরুজ পরিবেশে বসবাসকারী উদ্ভিদকে বলে মরুজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে বলে মরুজ প্রাণী। যেমন- ফণিমনসা, শতাব্দী উদ্ভিদ, খেজুর, করবী, ঘৃতকুমারী, শতমূলী, আকন্দ ইত্যাদি মরুজ উদ্ভিদ।

মরুজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। মরু উদ্ভিদ সাধারণত আকারে ছোট ও ঝোপযুক্ত হয়।

২। এদের কোষ অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের হয়, কোষসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে তেমন ফাঁক থাকে না এবং এদের কোষ প্রাচীর পুরু হয়।

৩। এদের পাতার শিরা-উপশিরা ঘন হয় এবং প্যালিসেড প্যারেনকাইমা কোষ অত্যন্ত দৃঢ় হয়। এদের পত্ররন্ধ্র বেশি থাকে এবং একটু গভীরে লুক্কায়িত থাকে।

৪। এদের মূল খুব গভীরে যায় অথবা মাটির কাছাকাছি অধিক জায়গা নিয়ে বিস্তৃত থাকে।

৫। এদের পাতা সাধারণত ছোট, পুরু, গুচ্ছাকার বা কাঁটায় রূপান্তরিত থাকে।

৬। এ উদ্ভিদের প্রস্বেদন চাপ অধিক থাকে, ফলে নেতিয়ে না পড়ার সহ্য শক্তি বেড়ে যায়। পাতা ও কান্ডের বহিঃত্বকে কিউটিকল থাকে।

৭। পাতা ও কান্ড অনেক সময় চ্যাপ্টা, রসালো ও সবুজ থাকে। এতে মিউসিলেজ বা ল্যাটেক্স থাকে। এপিডার্মিস বহুস্তরবিশিষ্ট হয়।

মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজন : মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজন প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা- অধিক পরিমাণ পানি শোষণ করে নেয়া এবং সংগৃহীত পানির অপচয় রোধ ও পরিমিত খরচ করা। নিম্নে এদের অভিযোজন বর্ণনা করা হলো-

১। স্বল্প বৃষ্টির পানি তাড়াতাড়ি মাটির গভীরে যায়, ফলে মাটির গভীর থেকে পানি শোষণের জন্য অনেক উদ্ভিদের মূল মাটির অনেক গভীরে প্রলম্বিত হয়। আরবের খেজুর গাছ মাটির ৫০ ফুট নিচ থেকে পানি আনতে সক্ষম। অনেক উদ্ভিদের মূল মাটির কাছাকাছি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত থাকে। সামান্য বৃষ্টির পানি মাটির গভীরে যাওয়ার পূর্বেই এরা দরকারী পানি শোষণ করে নিতে পারে।

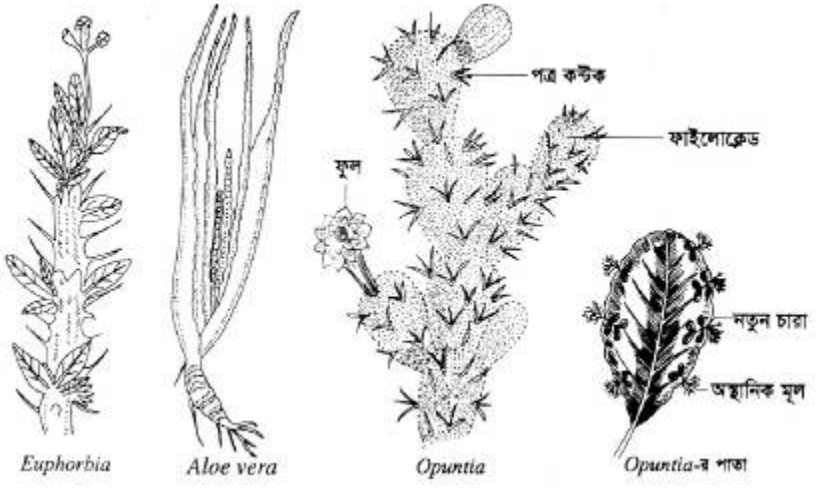

চিত্র ১৪.৩.২ : কয়েকটি মরুজ উদ্ভিদ

২। মরু উদ্ভিদের অভিস্রবণিক চাপ বেশি থাকে, ফলে পানি শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং প্রস্বেদনের হার কম হয়, তাই পানি সংগ্রহ সহজ হয় এবং পানি খরচ কম হয়।

৩। পানির অপচয় রোধ করতে প্রস্বেদন কম হওয়া দরকার। ফলে অনেক মরুজ উদ্ভিদের পাতা ঝরে পড়ে, কোন কোন উদ্ভিদের পাতা কাঁটায় পরিণত হয়, অধিকাংশ উদ্ভিদের পাতায় পুরু কিউটিকল থাকে এবং বহুস্তরবিশিষ্ট এপিডার্মিস থাকে। এসব কারণে প্রস্বেদন খুবই কম হয় এবং উদ্ভিদ তার দেহে দরকারী পানি ধরে রাখতে পারে।

৪। মরুজ উদ্ভিদের পাতায় অবস্থিত পত্ররন্ধ্রগুলো টিস্যুর গভীরে অবস্থিত এবং অনেকটা লুক্কায়িত, অনেক সময় রোম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ফলে প্রস্বেদন কম ঘটে এবং পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়।

৫। অধিকাংশ মরুজ উদ্ভিদের প্যারেনকাইমা কোষ স্থিতিশীল ও রসালো হয়, ফলে উদ্ভিদদেহ পানি ধরে রাখতে পারে।

৬। কান্ডে প্রচুর দৃঢ়তাপ্রদানকারী টিস্যু থাকায় খরায় নেতিয়ে যায় না। এছাড়া কোষগুলো ছোট আকারের, ঘন সন্নিবেশিত ও মোটা প্রাচীরবিশিষ্ট থাকায় পানির অপচয় রোধ হয় এবং গাছ নেতিয়ে পড়ে না।

মরুজ প্রাণীর অভিযোজন

১। কিছু মরুজ প্রাণী খাদ্যের সাথে শিশির বিন্দু শোষণ করে অল্প পরিমাণ পানির সংযোগ ঘটায়। কিছু প্রাণী সরস উদ্ভিদ ভোজন করে পানির চাহিদা পূরণে অভ্যস্ত। আবার কিছু প্রাণীর ত্বক পানিগ্রাহী স্বভাবের হওয়ায় চোষক কাগজের ন্যায় পানি শোষণে সক্ষম।

২। দেহ থেকে পানি যেন বের না হয় এজন্য মরুজ প্রাণীদের ত্বক পুরু ও আঁইশযুক্ত বা কণ্টকিত হয়।

৩। দিনের অধিক প্রখরতা দমনের জন্য এরা নিশাচর স্বভাব গ্রহণ করেছে এবং গর্তে বা সুড়ঙ্গে বাস করে। কারও কারও দেহে রক্ষণশীল আঁইশ বা খোলস থাকে।

৪। ধূলাবালি থেকে বাঁচার জন্য এদের নাসারন্ধ্র খুবই চিকন, অনেক ক্ষেত্রে কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। চক্ষুপল্লব এমনভাবে বন্ধ রাখতে পারে যাতে দেখতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় ।

৫। প্রতিকূল আবহাওয়া ও শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য দ্রুত চলাচলে সক্ষম।

৬। মরুজ প্রাণী যেখানে বসবাস করে সেখানকার ধূলাবালির সাথে নিজেদের দেহ গায়ের বর্ণ ধারণ করে। এতে শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে অতি সহজে টিকে থাকতে পারে।

৭। নিজেকে রক্ষার জন্য অনেক মরুজ প্রাণী বিষাক্ত রস ধারণ করে।

লবণাক্ত পরিবেশে অভিযোজন : যে সকল জীব লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতার সহিত খাপ খেয়ে বসবাস করতে পারে তাদেরকে লবণাক্ত পরিবেশের জীব বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য থাকায় এরা লবণাক্ত

পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে জীবনযাপন করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। লোনামাটির উদ্ভিদকে হ্যালোফাইট বলা হয়। বোরা, কেওড়া, পশুর, গোলপাতা, হারগোজা, সুন্দরী ইত্যাদি লোনা মাটির উদ্ভিদ।

লোনা মাটির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। লোনা মাটির উদ্ভিদের কান্ড ও পাতা রসালো থাকে।
২। এদের ঠেসমূল থাকে যা মাটির সামান্য নিচে বিস্তৃত অবস্থায় থাকে।
৩। এদের অনেকের আবার শ্বাসমূল (Pneumatophore) থাকে।
৪। এদের প্রস্বেদন হার অনেক কম থাকে।
৫। এদের অনেকের জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়।
৬। এদের কোষস্থ প্রোটোপ্লাজম কিছুটা আঠালো হয় এবং এদের অভিস্রবণিক চাপ বেশি থাকে।
৭। উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত খর্বাকার হয় এবং এদের বহিঃত্বক বহুস্তরবিশিষ্ট হয়।

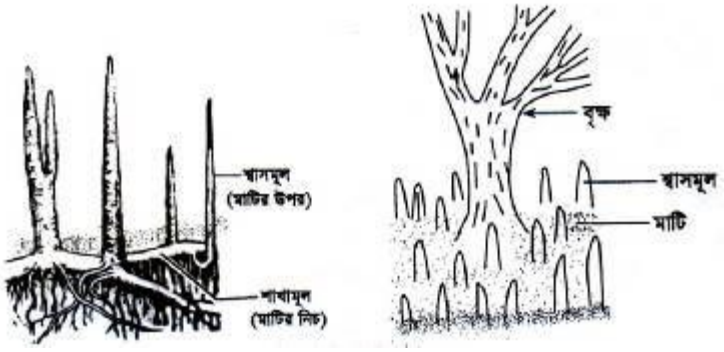

চিত্র ১৪.৩.৩ : লোনা মাটি উদ্ভিদের শ্বাসমূল

লবণাক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের অভিযোজন

১। মাটির গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, ফলে অধিকাংশ উদ্ভিদের মূলতন্ত্র মাটির খুব গভীরে না গিয়ে মাটির উপরের স্তরেই বিস্তৃত থাকে।
২। অধিক লবণাক্ত পানি শোষণ করতে অসুবিধা হয়, ফলে বৃষ্টির সময় লবণাক্ততা কিছুটা কমে আসলে উদ্ভিদ দ্রুত পানি শোষণ করে তাদের প্যারেনকাইমা কোষে সঞ্চিত রাখে। এ কারণে এদের কান্ড, পাতা ও মূলকে কিছুটা রসালো দেখায়।
৩। জোয়ার-ভাটার সময় পানির টানকে সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অনেক উদ্ভিদে ঠেসমূল বের হয়।
৪। শ্বাসমূলের ভেতরে বায়ুকুঠুরী থাকে এবং সে কুঠুরীতে বায়ু (O_2) ধরে রাখতে পারে। শ্বাসমূলের কারণে মূল ও বাইরের সাথে গ্যাসের বিনিময় সহজ হয়।
৫। লবণাক্ত মাটিতে এবং জোয়ার-ভাটার স্থানে বীজ এক স্থানে টিকে থাকা কঠিন। ফলে বহু উদ্ভিদে গাছে থাকা অবস্থায়ই বীজের অঙ্কুরোদগম আরম্ভ হয় এবং লম্বা ভ্রূণমূল সৃষ্টি হয়। মূল একটু বড় ও ভারী হলে মাটিতে পড়ে এবং কিছুটা কাঁদা মাটিতে ঢুকে পড়ে ও স্থায়ী হয়। এ ধরনের অঙ্কুরোদগমকে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। সমুদ্রতীরবর্তী জোয়ার-ভাটার অঞ্চলের লবণাক্ত পরিবেশে জন্মানো উদ্ভিদসমূহকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে।

চিত্র ১৪.৩.৪ : *Rhizophora* উদ্ভিদের জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম

লবণাক্ত পরিবেশে প্রাণীর অভিযোজন

লবণাক্ত পরিবেশ অর্থাৎ সুন্দরবনে রয়েছে অসংখ্য প্রজাতির মাছ, পাখি, সাপ, হরিণ, বাঘ, বানর, বনমোরগ, শুকর, কাছিম, কাঁকড়া ইত্যাদি। নোনা পানিতে যে সকল মাছ বাস করে তারা নোনা পানি গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে। স্তন্যপায়ীরাও অধিক সময় পানির নিচে থাকতে পারে এবং পানির উপরিতলে এসে শ্বাস নেয়। সুন্দরবনের অন্যান্য প্রায় সকল প্রাণীই প্রচুর খাদ্য প্রাপ্তির উপর অভিযোজিত। খাদ্যের অভাব হলে এরা স্থান ত্যাগ করতে পারে। কাছিম ডাঙ্গায় এসে বালির গর্তে ডিম পাড়ে। পানিতে সাঁতার কাটতে এরা অভিযোজিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে লবণাক্ত মাটির তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন	

সারসংক্ষেপ

একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে কোন জীবের খাপ খাইয়ে নেয়াটাই হলো ঐ জীবের অভিযোজন। বাসস্থানের ধরনের উপর ভিত্তি করে জীবগুলো জলজ, স্থলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশের হয়। যে সব উদ্ভিদ পানিতে জন্মায় তাদেরকে বলা হয় জলজ উদ্ভিদ। এরা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত, ভাসমান বা উভচর হতে পারে। যেমন- হাইড্রিলা, পাতা শেওলা, পাতা ঝাঁঝি, টোপাপানা, মাখনা, পানিকলা, পদ্ম, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ। যে সকল জীব পরিবেশের পানির অভাব সাফল্যের সাথে মেনে নিতে পারে এবং শুষ্কতা ও অধিক তাপমাত্রাকে আয়ত্ত্ব করার জন্য নিজেদের দেহের অঙ্গসংস্থানিক অভ্যন্তরীণ ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে বাস করতে পারে তাদেরকে মরুজ জীব বলে। মরুজ পরিবেশে বসবাসকারী উদ্ভিদকে বলে মরুজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে বলে মরুজ প্রাণী। যেমন- ফণিমনসা, শতাব্দী উদ্ভিদ, খেজুর, করবী, ঘৃতকুমারী, শতমূলী, আকন্দ ইত্যাদি মরুজ উদ্ভিদ। যে সকল জীব লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতার সহিত খাপ খেয়ে বসবাস করতে পারে তাদেরকে লবণাক্ত পরিবেশের জীব বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য থাকায় এরা লবণাক্ত পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে জীবনযাপন করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। লোনামাটির উদ্ভিদকে হ্যালোফাইট বলা হয়। বোরা, কেওড়া, পশুর, গোলপাতা, হারগোজা, সুন্দরী ইত্যাদি লোনা মাটির উদ্ভিদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। মরুজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য নিচের কোনটি ?

(ক) উদ্ভিদের মূল মাটির অনেক গভীরে প্রলম্বিত (খ) অভিস্রবণিক চাপ কম থাকে

(গ) এদের কোষগুলোর আকার বড় হয় (ঘ) প্রস্বেদনন হার বেশি হয়

২। নিচের উদ্ভিদগুলো জলজ-

i. টোপাপানা ii. মাখনা iii. পানিকলা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৪ বিভিন্ন ধরনের বায়োম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়োম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের বায়োম বর্ণনা করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	**বায়োম, স্থল বায়োম, জল বায়োম**

বায়োম : একই ধরনের জলবায়ু, মাটি এবং বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমকে বলা হয় বায়োম। একটি বড় ইকোসিস্টেমই একটি বায়োম। প্রধানতঃ ভূমিরূপ, জলবায়ু ও প্রধান ভেজিটেশন মিলিতভাবে এক একটি বায়োম সুনির্দিষ্ট করে। সারা বিশ্বে অনেক বায়োম রয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের বায়োম : বায়োম প্রধানত দু'রকমের। যথা- (ক) স্থল বায়োম ও (খ) জল বায়োম।

(ক) স্থল বায়োম : স্থল বায়োম বিভিন্ন রকমের হতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন রকমের স্থল বায়োম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১। মরুভূমি- মরুভূমি হলো এমন ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫ সে.মি. এর কম। এখানে বাষ্পায়নের হার অনেক বেশি কিন্তু জলীয় বাষ্প এখানে থাকে না। এ ধরনের মরুভূমি উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ৩০° ল্যাটিচুডে অবস্থিত। সকল মরুভূমি গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত নয়। সব থেকে বড় মরুভূমি সাহারা, যা আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় অর্ধেক স্থান জুড়ে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মরুভূমি রয়েছে। মরু পরিবেশে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য ৩০° সে. পর্যন্ত হয়। এখানে যে সকল উদ্ভিদ অভিযোজিত অবস্থায় আছে তাদেরকে জেরোফাইট (Xerophyte) বলে। এখানে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উভয় প্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। সাধারণত বছরে একবারই বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির সাথে সাথেই আগের বছরের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং খুব অল্প দিনেই বিকশিত হয়ে ফুল-ফলে ভরে যায়। সংক্ষিপ্ত জীবন শেষে এরা মরে যায়। মরুভূমির উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র সাধারণত রাত্রিতে খোলে, ফলে পানির অপচয় কম হয়। এদের বেশিরভাগই CAM উদ্ভিদ। ক্যাকটাস, বাবলা, খেজুর, কিছু ইউফরবিয়া, কিছু লিগিউম এবং কিছু অ্যাস্টারেসির উদ্ভিদ মরুভূমিতে জন্মে। প্রাণীরা সাধারণত রাত্রিতে চলাফেরা করে।

২। তৃণভূমি- এখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫-৭৫ সে.মি.। সাধারণত বছরে এক মৌসুমেই বৃষ্টিপাত হয়। ঘাস হলো তৃণভূমির প্রধান ভেজিটেশন। মধ্য কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়াতে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি রয়েছে। তৃণভূমি নানাবিধ তৃণভোজী প্রাণীর চারণ ক্ষেত্র। ঘাসের পাতা সরু এবং খাড়াভাবে থাকে ফলে প্রস্বেদন কম হয়।

৩। সাভানা- এখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০-১৫০ সে.মি.। সাভানা এক ধরনের বিশেষ তৃণভূমি। মাঝে মাঝে ছোট বৃক্ষ বা ঝোপ থাকে যা তৃণভূমিতে থাকে না। সাভানাতে দীর্ঘ শুকনো মৌসুম থাকে। ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের সীমানায় সাভানা সৃষ্টি হয়েছে। আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে সাভানা আছে।

৪। তুন্দ্রা- সব থেকে উত্তরের স্থল বায়োম হলো তুন্দ্রা। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কখনও ১৫ সে.মি. বা তারও কম, যা তুষার হিসেবে পড়ে। দীর্ঘ শীতের সময় এখানে বরফ জমা থাকে। ছয় থেকে আট সপ্তাহের গ্রীষ্মকাল দেখা যায় যখন উপরের কিছু বরফ গলে যায় এবং ছোট ছোট জলাভূমির সৃষ্টি হয়। এখানে সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে। তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ মস ও লাইকেন। এখানে বৃক্ষ প্রজাতি কম। উঁচু পর্বতশৃঙ্গে এরূপ অঞ্চল আছে, যাকে আলপাইন তুন্দ্রা বলে।

৫। ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট- বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কমপক্ষে ২৫০ সে.মি. থেকে ৪৫০ সে.মি.। বৃষ্টিপাত প্রায় সারা বছরই লেগে থাকে, তবে বর্ষাকালে অধিক হয়। সব চেয়ে বড় ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট হলো আমেরিকার আমাজান অববাহিকা, দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, এরপর আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, ভারত, বার্মা, মধ্য আমেরিকা এবং ফিলিপাইনের অংশবিশেষ ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে অবস্থিত।

ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে অসংখ্য প্রজাতির উঁচু বৃক্ষ জন্মায়। বনের মেঝে অন্ধকার ও ভেজা থাকে। এ সকল বনে কোন একক প্রজাতির উদ্ভিদ আধিপত্য বিস্তার করে না। ৩০-৪৫ মিটার উঁচু বৃক্ষের প্রজাতি দিয়ে বনের উপরের ক্যানোপি তৈরি

হয়। কিছু উঁচু বৃক্ষ এ ক্যানোপি ভেদ করে উপরে উঠে। এদেরকে ইমার্জেন্ট বলে। বৃক্ষকে অবলম্বন করে প্রচুর কাষ্ঠল লতা ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে স্পিসিস ডাইভারসিটি অধিক। এ সব ফরেস্টে অসংখ্য প্রজাতির পতঙ্গ, পাখি, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী ও উভচর প্রাণী বাস করে।

৬। ট্রপিক্যাল সিজনাল ফরেস্ট- ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট অঞ্চল থেকে এখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কিছুটা কম, তবে এখানকার বৃষ্টিপাত সারাবছর না হয়ে বিশেষ মৌসুমে (বর্ষাকালে) হয়। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সময় এ বন ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের ন্যায়, শীতকালে কিছু বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বন এ জাতীয়।

৭। পত্রঝরা বন- পত্রঝরা বনের বৃক্ষের পাতা বছরে একবার (বিশেষত শীতকালে বা শুকনো মৌসুমে) ঝরে পড়ে। এরা আবার দু'ধরনের। যথা- টেম্পারেট পত্রঝরা এবং ময়েস্ট পত্রঝরা।

টেম্পারেট পত্রঝরা বন- এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ১০০ সে.মি. কিন্তু তাপমাত্রা কম। শীতকালে সকল বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ে। উঁচু বৃক্ষের মধ্যে ওক, ম্যাপল, বীচ, বার্চ, চেস্টনাট প্রধান। আমেরিকা (পূর্বদিক), কানাডা (উত্তর-দক্ষিণ দিক) ইউরোপ (মধ্য ও উত্তর বৃটেন, নরওয়ে, সুইডেন), রাশিয়া, পূর্ব এশিয়া, চায়না, কোরিয়া ইত্যাদি দেশে এ বন রয়েছে। এ বনের মেঝেতে প্রচুর বরফ জমা হয়। এ অঞ্চলে তুষারপাত হয়।

ময়েস্ট পত্রঝরা বন- এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত (২০০ সে.মি.) অপেক্ষাকৃত বেশি। শীত অপেক্ষাকৃত কম, বরফ পড়ে না। এ বনের অধিকাংশ বৃক্ষই পত্রঝরা। বাংলাদেশের শালবন ময়েস্ট পত্রঝরা বন।

৮। কনিফার ফরেস্ট- এ অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ সে.মি.। এখানে দীর্ঘ শীতকাল এবং সংক্ষিপ্ত গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কনিফার ফরেস্ট রয়েছে। প্রধান বৃক্ষ পাইন, স্প্রুস, ফার, রেডউড, হেমলক ইত্যাদি। এদের অধিকাংশই চির সবুজ।

(খ) জল বায়োম : নিম্নে জল বায়োম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

জল বায়োম মিঠাপানি এবং সাগরে পৃথক ধরনের। মিঠাপানির বায়োম নদী, হ্রদ, হাওড়, বাওড়, ওয়েটল্যান্ড ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। ম্যানগ্রোভ্ বনাঞ্চল ওয়েটল্যান্ড বায়োমের অন্তর্ভুক্ত। ম্যানগ্রোভ্স ৩২° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ ল্যাটিচুডের মাঝামাঝি উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচে উল্লিখিত বায়োমের একটি করে উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন		
পত্রঝরা বন	তুন্দ্রা	সাভানা	মিঠাপানি

সারসংক্ষেপ

একই ধরনের জলবায়ু, একই ধরনের মাটি, একই জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমকে বলা হয় বায়োম। একটি বড় ইকোসিস্টেমই একটি বায়োম। বিভিন্ন ধরনের স্থল ও জল বায়োম রয়েছে। যথা- **স্থল বায়োম :** মরুভূমি, তৃণভূমি, সাভানা, তুন্দ্রা, ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট, ট্রপিক্যাল সিজনাল ফরেস্ট, পত্রঝরা বন, কনিফার ফরেস্ট। **জল বায়োম :** জল বায়োম মিঠাপানি এবং সাগরে পৃথক ধরনের। মিঠাপানির বায়োম নদী, হ্রদ, হাওড়, বাওড়, ওয়েটল্যান্ড ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। ম্যানগ্রোভ্ বনাঞ্চল ওয়েটল্যান্ড বায়োমের অন্তর্ভুক্ত। ম্যানগ্রোভ্ ৩২° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ ল্যাটিচুডের মাঝামাঝি উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। মরুভূমিতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো-

(ক) ২৫ সেমি এর কম (খ) ২৫ সেমি এর বেশি

(গ) ৩০ সেমি এর বেশি (ঘ) ৪০ সেমি

২। স্থল বায়োমগুলো হলো-

i. মরূভূমি ii. তৃণভূমি iii. সাভানা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং প্রধান প্রধান উদ্ভিদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বনাঞ্চরের নাম বলতে পারবেন।
- বনাঞ্চলগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং এতে বিদ্যমান প্রধান প্রধান উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	**চির সবুজ ও উপ চির সবুজ, পত্রঝরা, ম্যানগ্রোভ**

বাংলাদেশের বনাঞ্চল : বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ যার আয়তন প্রায় ১,৪৪,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। এর পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব এ তিন দিকেই রয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার দক্ষিণাংশ নাফ নদী দ্বারা মিয়ানমার হতে আলাদা। আর আমাদের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এদেশের বড় অংশ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। অবশিষ্ট অংশে বিভিন্ন আকার ও আয়তনের বন দেখা যায়। একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা উচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে বনাঞ্চলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে শতকরা ১০ ভাগের ন্যায়। বনের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের বনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (১) চির সবুজ ও উপ চির সবুজ বনাঞ্চল, (২) পত্রঝরা বনাঞ্চল এবং (৩) ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

হরিণের চারণভূমি

গোল পাতার বন

চিত্র ১৪.৫ : সুন্দর বনের দুটি দৃশ্য

চির সবুজ ও উপ চির সবুজ বনাঞ্চল : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চির সবুজ ও উপচির সবুজ বন অবস্থিত।

বৈশিষ্ট্য

১। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২২৫ সে.মি. (চট্টগ্রাম) হতে ৫০০ সে.মি. (সিলেট), ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে।

২। মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ বেশি। একে অম্লীয় মাটি বলে।

৩। বন অপেক্ষাকৃত বড়।

৪। এখানে ছোট ছোট পাহাড় ও মাঝে মধ্যে খাদ দেখা যায়।

৫। উদ্ভিদের অধিকাংশই চির সবুজ প্রকৃতির।

প্রধান প্রধান উদ্ভিদ : সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে সিভিট, গর্জন, চন্দুল। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে নাগেশ্বর, বাটনা, পিতরাজ ইত্যাদি। পত্রঝরা বৃক্ষের মধ্যে কড়ই, গামার, ভাদি, চাপালিশ, উদাল ইত্যাদি। এ বনে প্রচুর পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, কচু জাতীয় উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রজাতির ফার্ণ জন্মে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক দুর্গম ও বিস্তার এলাকা নিয়ে বাঁশবন অবস্থিত। অধিকাংশ বাঁশই মূলী বাঁশ, জুম চাষের পর দীর্ঘদিন পড়ে থাকা এলাকায় ছন বন রয়েছে। ছন বনের প্রধান উদ্ভিদ ছন ও খাগড়া। বার্মা থেকে বীজ এনে ১৮৬১ সালে প্রথম কাপ্তাই এলাকায় সেগুনের বাগান করা হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেগুনের বন রয়েছে। সিলেটের উত্তরাংশে জলাবদ্ধ বন রয়েছে যেখানে নল, খাগড়

এবং ইকড় প্রধান উদ্ভিদ। হিজল গাছ প্রধান বৃক্ষের মধ্যে একটি। বাংলাদেশের একমাত্র বন্য গোলাপ এখানে পাওয়া যায়। বৃহত্তর সিলেটের বনাঞ্চলের মধ্যে রেমাকেলেঙ্গা, লাউয়াছড়া, সাতছড়ি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য নাম। সিভিট এবং গর্জন চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যথেষ্ট পাওয়া গেলেও সিলেটের বনে স্বল্প সংখ্যায় পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর বেত জন্মায়।

পত্রঝরা বনাঞ্চল : ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, কুমিল্লার ময়নামতি এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে এ বন অবস্থিত। ময়নামতির বন শালবন বিহার, শেরপুর জেলার একটি বন রাংটিয়া ও আরেকটি গজনী বন নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য

১। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২ সে.মি. (বরেন্দ্র অঞ্চলে) হতে ১৭৫ সে.মি. (ঢাকায়)। ফলে বাতাসের আর্দ্রতা তুলনামূলক কম।
২। শীতের সময় এ বনের গাছের পাতা ঝরে যায়।
৩। মাটির বর্ণ লাল, মাটি বেশ অম্লীয়, বর্ষায় কর্দমাক্ত ও শীতের সময় শুকনো থাকে।
৪। বন তুলনামূলক কম ঘন, তবে মধুপুর অঞ্চলের বন ঘন।
৫। উঁচু 'চালা' এবং ফাঁকে ফাঁকে সমতলভূমি 'বাইদ' অবস্থিত। চালায় বন এবং বাইদে ধান চাষ হয়।

প্রধান প্রধান উদ্ভিদ : শাল এ বনের প্রধান বৃক্ষ যার পরিমাণ কোন কোন জায়গায় শতকরা ৯৮ ভাগ পর্যন্ত। তাই এ বনের অপর নাম শালবন। বর্তমানে অধিকাংশ মূল শাল বৃক্ষই কর্তিত। মূল বৃক্ষের গোড়া থেকে গজানো চারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান বন। তাই এর আরেক নাম গজারী বন। প্রধান বৃক্ষ শাল ছাড়াও এখানে চালতা, কড়ই, কুম্ভী, বহেড়া, কুড়চি ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে। এছাড়া শতমূলী, উলট চন্ডাল এবং স্বর্পগন্ধা তিনটি বিপদাপন্ন ভেষজ উদ্ভিদ এ বনে দেখা যায়।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল : লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত ভেজা মাটির বন যা দিনে দু'বার জোয়ারের তলিয়ে যায় তাকে ম্যানগ্রোভ বন বলা হয়। ম্যানগ্রোভ বনের বড় অংশ পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ হতে আরম্ভ করে পশ্চিমে বৃহত্তর খুলনা পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কাছে রায়মঙ্গল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশ সুন্দরবন নামে পরিচিত। এছাড়া মাতামুহুরী নদীর মোহনায় চকোরিয়া সুন্দরবন এবং নাফ নদীর তীরে কিছু ম্যানগ্রোভ বন দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য

১। এ বন চির সবুজ।
২। বনের নিম্নাঞ্চল প্রতিদিন দু'বার জোয়ারের পানিতে ভিজে যায়।
৩। মাটি ও পানি লবণাক্ত।
৪। মাটিতে অক্সিজেনের অভাব থাকায় অধিকাংশ উদ্ভিদে শ্বাসমূল বের হয়।
৫। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়।
৬। অসংখ্য নদী-উপনদী ও চ্যানেল দ্বারা সুন্দরবন ছোট ছোট অংশে বিভক্ত।

প্রধান প্রধান উদ্ভিদ- নদীপাড়ের কম লবণাক্ত পানিতে গোলপাতা, হিতাল, সুন্দরী, গেওয়া, গরান ইত্যাদি জন্মে। অধিক লবণাক্ত পরিবেশে কাঁকড়া, বাইন, পশুর, ধুন্দুল ইত্যাদি জন্মে। প্রধান লতা সুন্দরীলতা এবং গুল্ম জাতীয় বোহাল ও হাড়গোজা প্রধান। সুন্দরবনে টাইগার ফার্ণের ঝোপ রয়েছে। এখানে কোন বাঁশ জন্মে না। তবে নানা রকমের অর্কিড জন্মে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে পত্রঝরা এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের দুটি করে উদ্ভিদের নাম লিখুন		
পত্রঝরা বনাঞ্চল		ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল	

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ যার আয়তন প্রায় ১,৪৪,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। এর পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব এ তিন দিকেই রয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার দক্ষিণাংশ নাফ নদী দ্বারা মিয়ানমার হতে আলাদা। আর আমাদের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এদেশের বড় অংশ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। অবশিষ্ট অংশে বিভিন্ন আকার ও আয়তনের বন দেখা যায়। একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা উচিত।

বাংলাদেশে বর্তমানে বনাঞ্চলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে শতকরা ১০ ভাগের ন্যায়। বনের ধরনের অনুযায়ী বাংলাদেশের বনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (১) চির সবুজ ও উপচির সবুজ বনাঞ্চল, (২) পত্রঝরা বনাঞ্চল এবং (৩) ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চির সবুজ ও উপচির সবুজ বন অবস্থিত। ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, কুমিল্লার ময়নামতি এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে এ বন অবস্থিত। ময়নামতির বন শালবন বিহার, শেরপুর জেলার একটি বন রাংটিয়া ও আরেকটি গজনী বন নামে পরিচিত। লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত ভেজা মাটির বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলা হয়। ম্যানগ্রোভ বনের বড় অংশ পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ হতে আরম্ভ করে পশ্চিমে বৃহত্তর খুলনা পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কাছে রায়মঙ্গল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশ সুন্দরবন নামে পরিচিত। এছাড়া মাতামুহুরী নদীর মোহনায় চকোরিয়া সুন্দরবন এবং নাফ নদীর তীরে কিছু ম্যানগ্রোভ বন দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?

(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬

২। চির সবুজ ও উপ চির সবুজ বন অবস্থিত-

i. চট্টগ্রাম অঞ্চলে ii. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে iii. সিলেট অঞ্চলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৬ উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে অভিযোজনকারী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন।
- উপকূলীয় অঞ্চলে অভিযোজনকারী উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	**উপকূলীয় বনাঞ্চল**

বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক স্থল বেষ্টিত কিন্তু দক্ষিণ দিকে রয়েছে খোলা বঙ্গোপসাগর। আর এর দক্ষিণে বিশেষ করে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা সরাসরি সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ সাগর পাড়ে অর্থাৎ উপকূলে রয়েছে বনাঞ্চল। এর নাম উপকূলীয় বনাঞ্চল। এছাড়াও সন্দ্বীপ, মহেশখালী, উড়িরচর, চর কুকড়ি মুকড়িসহ অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ ও চর এলাকা রয়েছে সাগরবক্ষে।

উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য : সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাটার কারণে মাটি কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত থাকে। এসব জায়গায় অভিযোজনের জন্য উদ্ভিদে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

১। উপকূলীয় এলাকা জোয়ারের পানিতে নিয়মিত সিক্ত হয় এবং পানি লবণাক্ত হয়। একটু উঁচু জায়গায়ও মাঝে মধ্যে জোয়ারের পানি প্রবেশ করে। কাজেই লবণাক্ত পানিতে জন্মাতে পারে এমন প্রজাতি সবুজ বেষ্টনীর জন্য নির্বাচন করতে হবে।

২। মূলতন্ত্রের মাধ্যমে মাটি ধরে রাখতে পারে এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৩। ঝড়ের ঝাপটায় সহজে ভেঙ্গে না যায় বা মূলোৎপাটিত না হয় এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৪। সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ থেকে খাদ্য, পশুখাদ্য, পানীয়, জ্বালানি, কাঠ ও অন্যান্য অর্থকরী সম্পদ প্রাপ্তির সুবিধা থাকতে হবে।

উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের নাম- কেওড়া *(Soneratia apetala)*, সুন্দরী (*Heritiera fomes*), বাইন (*Avicennia alba*), রাইজোফোরা (*Rhizophora*), পশুর (*Xylocarpus mekongensis*), নারিকেল (*Cocos nucifera*), সুপারি (*Areca catechu*), গাব (*Diospyros peregrina*), বিলাতি গাব (*Diospyros discolor*) ইত্যাদি বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে উল্লিখিত উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন	
কেওড়া	পশুর	সুন্দরী

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক স্থল বেষ্টিত কিন্তু দক্ষিণ দিকে রয়েছে খোলা বঙ্গোপসাগর। আর এর দক্ষিণে বিশেষ করে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা সরাসরি সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ সাগর পাড়ে অর্থাৎ উপকূলে রয়েছে বনাঞ্চল। এর নাম উপকূলীয় বনাঞ্চল। এছাড়াও সন্দ্বীপ, মহেশখালী, উড়িরচর, চর কুকড়ি মুকড়িসহ অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ ও চর এলাকা রয়েছে সাগরবক্ষে। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাটার কারণে মাটি কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত থাকে। এসব জায়গায় অভিযোজন করার জন্য

উদ্ভিদে কিছু বিশিষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়নের জন্য কেওড়া, সুন্দরী, বাইন, রাইজোফোরা, পশুর, নারিকেল, সুপারি, গাব, বিলাতি গাব ইত্যাদি বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত নিচের কোনটি ?

(ক) বঙ্গোপসাগর (খ) ভারত মহাসাগর

(গ) এন্টার্কটিক মহাসাগর (ঘ) আটলান্টিক মহাসাগর

২। উপকূলীয় বনাঞ্চলের জন্য বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত-

i. কেওড়া ii. বাইন iii. বাঁশ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৭ উপকূলীয় এলাকায় বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বনাঞ্চল তৈরির কারণ বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	সবুজ বেস্টনী

উপকূলীয় এলাকায় বনাঞ্চল তৈরির কারণ : প্রাকৃতিক অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ একটি ঝড় প্রবণ এলাকা। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সিডর, টর্নেডো, প্রতি বছরই উপকূলীয় এলাকায় আঘাত করে। এর ফলে একদিকে যেমন ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে অপরদিকে তেমন সম্পদহানিও ঘটে। সমুদ্রের দ্বীপ ও চর এলাকা সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। তাই বিস্তীর্ণ এলাকাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার একটি চমৎকার উপায় হলো উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরিকরণ। সবুজ বেষ্টনী হলো উপকূলীয় বনাঞ্চল তৈরির মাধ্যমে একটি শক্ত ও মজবুত বেষ্টনী তৈরি করা। ১৯৯১ সালে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এর প্রেক্ষিতে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত মানুষ ও তাদের সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং উপকূলীয় বনবিভাগ নামে একটি বনবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। প্রাথমিকভাবে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার ৩০০ কিলোমিটার উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

উপকূলীয় অঞ্চলে বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা

১। সবুজ বেষ্টনী সমুদ্র হতে আসা জলোচ্ছ্বাসকে প্রাথমিকভাবে প্রতিহত করে এবং জলোচ্ছ্বাসের গতি, প্রচন্ডতা ও উচ্চতা বহুলাংশে কমিয়ে আনে।
২। জলোচ্ছ্বাসকালীন ভাটার টানে মানুষ, পশু ও অন্যান্য সম্পদ ভেসে যাওয়া হতে রক্ষা করে।
৩। ঝড়ের গতিবেগ, ঝাপটা ও ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
৪। বাসস্থান গভীর পানিতে তলিয়ে গেলে বৃক্ষের উপর উঠে আত্মরক্ষা করতে পারে।
৫। সবুজ বেষ্টনীতে লাগানো বৃক্ষ হতে দরকারী জ্বালানি কাঠ, খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে উপকূলীয় অঞ্চলে বনাঞ্চল তৈরির দুটি প্রয়োজনীয়তা লিখুন

সারসংক্ষেপ

১৯৯১ সালে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এর প্রেক্ষিতে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত মানুষ ও তাদের সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং উপকূলীয় বনবিভাগ নামে একটি বনবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। প্রাথমিকভাবে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার ৩০০ কিলোমিটার উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। বিস্তীর্ণ এলাকাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার একটি চমৎকার উপায় নিচের কোনটি ?

(ক) উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরিকরণ

(খ) ঘর-বাড়ি তৈরিকরণ

(গ) সমুদ্র উপকূল লিজ দেয়া

(ঘ) বেড়িবাঁধ তৈরি করা

২। উপকূলীয় বনাঞ্চল তৈরির দরকার-

i. জলোচ্ছ্বাসকে প্রাথকিভাবে প্রতিহত করার জন্য

ii. জ্বালানি কাঠ, খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পাওয়ার জন্য

iii. ঝড়ের গতিবেগ, ঝাপটা ও ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৮ বিলুপ্তপ্রায় জীব, জীব বিলুপ্তির কারণ এবং বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিলুপ্তপ্রায় জীব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জীব বিলুপ্তির কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	**বিলুপ্তপ্রায় জীব**

বিলুপ্তপ্রায় জীব : বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ুর প্রকৃতি জীববৈচিত্র্য ধারণের জন্য অনুকূল, ফলে এদেশের উদ্ভিদকূল ও প্রাণীকূল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এ সকল জীবের বেশিরভাগ প্রজাতিসমূহ বাংলাদেশের বনাঞ্চলসমূহে রয়েছে। কিন্তু এ বৈচিত্র্যময় জীবসমূহের অনেকেই আজ বিলুপ্তির পথে। জীববৈচিত্র্যের রেকর্ড আরম্ভ হয় কার্যত ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর হতে। এর আগে কোন দেশেরই জীববৈচিত্র্যের তালিকা তৈরি হয়নি। এখনও অনেক দেশ রয়েছে যেখানে জীববৈচিত্র্যের কোন তালিকা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে জীববৈচিত্র্যে সংকট দেখা দিয়েছে। তালিকাভূক্ত বহু প্রজাতি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বহু প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। অনেক প্রজাতি রয়েছে যা পৃথিবী হতে বিলুপ্ত না হলেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাংলাদেশেও এমন অনেক জীব প্রজাতি বিদ্যমান রয়েছে যাদেরকে পূর্বে সচরাচর দেখা গেলেও এখন দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় কয়েকটি জীব প্রজাতির তালিকা

বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ

লোকাল নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্রের নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি
তালিপাম	*Corypha taliera*	Arecaceae	পাম জাতীয় উদ্ভিদ
মল্লিকা ঝাঁঝি	*Aldrovanda vesiculosa*	Droseraceae	জলজ ও পতঙ্গভূক উদ্ভিদ
ক্ষুদে বাড়লা	*Knema bengalensis*	Myristicaceae	বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ
কোরুদ	*Licuala peltata*	Arecaceae	পাম জাতীয় উদ্ভিদ
রোট্যালা	*Rotala simliciuscula*	Lythraceae	উভচর জলজ উদ্ভিদ

বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী

লোকাল নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	প্রাণীর প্রকৃতি
রাজশকুন	*Sarcogyps calvus*	পাখি
ঘড়িয়াল	*Gavialis gangeticus*	সরীসৃপ
মিঠা পানির কুমির	*Crocodylus palustris*	সরীসৃপ
নীল গাই	*Boselaphus tragocamelus*	স্তন্যপায়ী
শুশুক	*Orcaella brevirostris*	স্তন্যপায়ী জলজ

জীব বিলুপ্তির কারণ : নানাবিধ কারণে বিভিন্ন জীব প্রজাতি আজ বিলুপ্ত হয়েছে এবং কিছু বিলুপ্তির পথে। প্রধানত দুটি কারণে জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে। যথা- (ক) ইকোলজিক্যাল কারণ ও (খ) মানব সৃষ্ট কারণ।

ইকোলজিক্যাল কারণ

১। কম জীবগোষ্ঠী ও কম বিস্তৃতি অঞ্চল- কোন প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর সংখ্যা কম হলে এবং বিস্তৃতি অঞ্চল সংকীর্ণ হলে তার বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

২। গুচ্ছ বণ্টন- স্থানে স্থানে গুচ্ছবণ্টিত জীব প্রজাতির সহজে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩। **বড়দেহ ও খাদ্য শৃঙ্খলে উপরে অবস্থান-** খাদ্য শৃঙ্খলে যার অবস্থান যত উপরে তার বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি থাকে।

৪। **কলোনিকরণের ক্ষমতা-** যে সব প্রজাতি নতুন পরিবেশে বংশবিস্তারের মাধ্যমে কলোনি সৃষ্টি করতে পারে না সে সব প্রজাতি সহজে বিলুপ্ত হয়।

৫। **পরিবেশীয় নিয়ামকের অস্থিরতা-** পরিবেশীয় নিয়ামক সমূহের অস্থিরতায় দুর্লভ প্রজাতিগুলো টিকে থাকতে পারে না।

৬। **প্রাকৃতিক বিপর্যয়-** ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, হিমবাহ, ভূমিধ্বস, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে সহজেই দুর্লভ প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে।

মানব সৃষ্ট কারণ

১। **বাসস্থান ধ্বংস-** জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সব থেকে বড় কারণ হলো তাদের বাসস্থান ধ্বংস করা। বর্তমানে প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে ৫০ একর বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে। জলাভূমি ভরাট করা জলজ প্রাণীর বিলুপ্তির কারণ।

২। **এক্সপ□য়টেশন-** সম্পদের অতিমাত্রায় আহরণ বহু জীব প্রজাতি বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩। **অতিমাত্রায় পশু চারণ-** তৃণভূমিতে অতিমাত্রায় পশুচারণের ফলে অনেক উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্তির পথে।

৪। **পলিনেটর ধ্বংস-** মৌমাছিসহ বহু কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের পরাগায়ন ঘটায়। অতিমাত্রায় কীটনাশক, পতঙ্গনাশক ব্যবহারের ফলে পরাগায়নের এ বাহকগুলো কমে গিয়েছে। তাই পরাগায়নের অভাবে এ সকল উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ বিলুপ্তির পথে রয়েছে।

৫। **পরিবেশ দূষণ-** পরিবেশ দূষণ জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা : পৃথিবীতে প্রত্যেক জীবের বেঁচে থাকার গুরুত্ব রয়েছে। এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার করে। তাই বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতিসমূহকে সংরক্ষণ করা দরকার। কারণ সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। এ খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে সমস্ত প্রাণিকূল। তাই বাঁচার তাগিদে বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করা দরকার। প্রতিটি জীব কোন না কোন ইকোসিস্টেমের খাদ্য শৃঙ্খলের সদস্য। কোন জীবের আকস্মিক বিলুপ্তি ঘটলে ইকোসিস্টেমের কার্যকারিতা ব্যাহত হবে। পরিবেশ ও ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। এ উদ্দেশ্যে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহকে সংরক্ষণ করা উচিত। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাণী প্রজাতিসমূহ যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করছে, অন্যদিকে সবুজ উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করছে। মাটি ক্ষয়রোধে অনেক উদ্ভিদ প্রজাতি ভূমিকা রাখে। এজন্য বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসহ সকল জীবকে সংরক্ষণ করা উচিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে বিলুপ্তপ্রায় দুটি উদ্ভিদ ও দুটি প্রাণীর নাম লিখুন		

সারসংক্ষেপ

জীববৈচিত্র্যের রেকর্ড আরম্ভ হয় কার্যত ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর হতে। এর আগে কোন দেশেরই জীববৈচিত্র্যের তালিকা তৈরি হয়নি। এখনও অনেক দেশ রয়েছে যেখানে জীববৈচিত্র্যের কোন তালিকা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে জীববৈচিত্র্যে সংকট দেখা দিয়েছে। তালিকাভূক্ত বহু প্রজাতি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বহু প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। অনেক প্রজাতি রয়েছে যা পৃথিবী হতে বিলুপ্ত না হলেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাংলাদেশেও এমন অনেক জীব প্রজাতি আছে যাদেরকে পূর্বে সচরাচর দেখা গেলেও এখন দেখা যাচ্ছে না। নানাবিধ কারণে বিভিন্ন জীব প্রজাতি আজ বিলুপ্ত হয়েছে এবং কিছু বিলুপ্তির পথে। প্রধানত দুটি কারণে জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে। যথা- (ক) ইকোলজিক্যাল কারণ ও (খ) মানব সৃষ্ট কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। তালিপাম এর গোত্র নিচের কোনটি ?

(ক) Arecaceae
(খ) Droseraceae
(গ) Myristicaceae
(ঘ) Lythraceae

২। জীব প্রজাতি বিলুপ্তির ইকোলজিক্যাল কারণ হলো-

i. গুচ্ছ বণ্টন
ii.কলোনিকরণের ক্ষমতা
iii. প্রাকৃতিক বিপর্যয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৯ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	**ইন সিটু কনজারভেশন, এক্স সিটু কনজারভেশন**

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ : জীবজগতকে মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে হলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বর্তমানে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এর জন্য বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সংস্থা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আরম্ভ হয়েছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজ। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলতে বর্তমান জীবকুলের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিমিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারকে বোঝায় যাতে করে বর্তমান প্রজন্ম তাদের দরকার অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারে এবং উক্ত ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখতে পারে।

বিখ্যাত বাস্তুতত্ত্ববিদ E.P. Odum (1971) এর মতে 'মানুষের সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর, ও সুখময় জীবন ধারা অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে অনুকূল ভারসাম্যপূর্ণ ও বসবাসযোগ্য পরিবেশ বজায় রাখার তাগিদে জীব সম্প্রদায়কে অপচয়, ধ্বংস ও বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষার জন্য সুপরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কৌশলকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলে'।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতি মূলত দুটি। যথা- (ক) ইন সিটু কনজারভেশন এবং (খ) এক্স সিটু কনজারভেশন।

(ক) **ইন সিটু কনজারভেশন (In situ conservation) :** মূল বাসস্থানে তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের বিবর্তনীয় গতিশীল ইকোসিস্টেমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করাকে ইন-সিটু কনজারভেশন বলে। যেমন- সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ সুন্দরবনের কর্দমাক্ত, লবণাক্ত ও সিক্ত পরিবেশে জন্মে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুন্দরবনে বিচরণ করে। সুন্দরী গাছ বা রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনের এরূপ বাস্তুতন্ত্রে সংরক্ষণ করা হলো ইন সিটু কনজারভেশন। ন্যাশনাল পার্ক, অভয়ারণ্য ও মৎস্য অভয়ারণ্য সৃষ্টির মাধ্যমে ইন সিটু পদ্ধতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায়।

ন্যাশনাল পার্ক- প্রাকৃতিকভাবে সৌন্দর্যমন্ডিত তুলনামূলকভাবে বৃহৎ এলাকা যেখানে বন্যজীব সুরক্ষিত থাকবে। গবেষণা ও বিনোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এ জাতীয় পার্কে প্রবেশ করা যায়। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঠিত বাংলাদেশের কিছু ন্যাশনাল পার্কের তালিকা হলো-

সংরক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
রামসাগর জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৫২	১৯৬০
মধুপুর জাতীয় উদ্যান	ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল	৮৪৩০	১৯৬২
হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	১৭২৯	১৯৮০
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	গাজীপুর	৫০২২	১৯৮২
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজার	১২৫০	১৯৯৬
কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫৪৬৪	১৯৯৯
নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান	নোয়াখালী	১৬৩৫২	২০০১
মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৩৯৬	২০০৪
সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জ	২৪৩	২০০৫

এছাড়াও ইকোপার্ক, সাফারী পার্ক, গেম রিজার্ভ ইত্যাদিতেও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

অভয়ারণ্য- যে সকল সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সব ধরনের শিকার, পশুপাখি হত্যা বা ধরা এবং জন সাধারণের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ তাকে অভয়ারণ্য বলে। এ সব এলাকায় বন্য প্রাণীরা নির্বিঘ্নে প্রজনন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বন্য প্রাণীর বন্যতা রক্ষা করাই অভয়ারণ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ তথা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৮টি অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যথা-

সংরক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	২৯০৯	১৯৭০
চর কুকরি-মুকড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	ভোলা	৪০	১৯৮১
পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খাগড়াছড়ি	৪২০৮৭	১৯৮৩
চুনাতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৭৭৬১	১৯৮৬
সুন্দরবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (পূর্ব)	বাগেরহাট	৩১২২৭	১৯৯৬
সুন্দরবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (পশ্চিম)	সাতক্ষীরা	৭১৫০২	১৯৯৬
সুন্দরবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (দক্ষিণ)	খুলনা	৩৬৯৭০	১৯৯৬
রেমাকেলেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	১৭৯৬	১৯৯৬

মৎস্য অভয়াশ্রম- দেশের কিছু জলাশয় যেমন নদী, খাল, বিল মৎস্য উৎপাদনের জন্য সরকারিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ সকল জলাশয়সমূহে মাছ ধরা বা মারা এবং জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। একে মৎস্য অভয়াশ্রম বলে। স্বাদু পানির ২৬০টি মৎস্য প্রজাতির মধ্যে ৫৪টি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি এরূপ মৎস্য অভয়াশ্রমে স্বাধীনভাবে প্রজনন ও দৈহিকভাবে বাড়তে পারে। অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গত দশকে বহু অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। এতে চিতল, ফলি, কালবাউস, পাবদা, গজার ইত্যাদি মাছের বংশবৃদ্ধি ঘটছে। আরও কিছু মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করে বিলুপ্তপ্রায় বা সংখ্যা হ্রাস পাওয়া প্রজাতিসমূহ রক্ষার সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে দেশি মাছগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য বৃহত্তর সিলেটের টাঙ্গুয়ার হাওড় ও হাকালুকি হাওড় এবং চট্টগ্রামের মাছ প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদী এ ধরনের মৎস্য অভয়াশ্রমের উদাহরণ।

(খ) **এক্স সিটু কনজারভেশন (Ex situ conservation) :** জীববৈচিত্র্যের উপাদানসমূহকে তাদের মূল বাসস্থান বা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে বাঁচিয়ে রাখাই হলো এক্স সিটু কনজারভেশন। যেমন- সুন্দরবনের সুন্দরী গাছকে ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে লাগিয়ে সংরক্ষণ করা হলো এক্স সিটু কনজারভেশন। নিম্নলিখিত উপায়ে এক্স সিটু কনজারভেশন করা যায়-

১। **বোটানিক গার্ডেন-** সারাবিশ্বে ১৬০০ এর অধিক বোটানিক গার্ডেন রয়েছে। এতে দুর্লভ প্রজাতি, অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি এবং ট্যাক্সোনমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির উদ্ভিদ বপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বোটানিক গার্ডেনে এমন কিছু প্রজাতি সংরক্ষিত আছে যা বাংলাদেশের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এ রকম অন্যান্য বোটানিক গার্ডেনগুলোতেও কিছু কিছু দুর্লভ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। তাই বিলুপ্তির হাত হতে উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহকে সংরক্ষণের বড় উপায় হলো বোটানিক গার্ডেন।

২। **সীড ব্যাংক-** সীড ব্যাংকে স্বল্প পরিসরে অল্প পরিশ্রমে ও অল্প খরচে অধিক প্রজাতি ধরে রাখা যায়। ফলে এটি উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের একটি সহজতর উপায়। এতে এমন অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির বীজ সংরক্ষিত আছে যা বাস্তবে বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন- *Bromus interruptus* (Kackel) Druce ও *Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla এমন দুটি প্রজাতি যারা বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু সীড ব্যাংকে এদের বীজ সংরক্ষিত রয়েছে। বীজকে শুকিয়ে -২০°C তাপমাত্রায় ফ্রিজিং করলে প্রায় অধিকাংশ উদ্ভিদ প্রজাতির বীজকেই (Orthodex seed) শতাব্দীর পর শতাব্দী অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতাসহ সংরক্ষণ করা যায়। এ ধরনের বীজ সবীজী উদ্ভিদের প্রায় ৭০ ভাগ। অন্য ৩০ ভাগ বীজ Recalcitrant বীজ হিসেবে পরিচিত। যে সব বীজকে শুকালে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয় তাকে Recalcitrant বীজ বলে যেমন- আম।

৩। **ফিল্ড জিন ব্যাংক-** ফিল্ড জিন ব্যাংকের মাধ্যমে Recalcitrant বীজবাহী উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা সম্ভব। কোন প্রজাতির স্বাভাবিক এলাকার বাইরে অন্য কোন স্থানে এসব প্রজাতির জীবন্ত নমুনা সংরক্ষণ করা হয়। শস্য প্রজাতির জন্য এ প্রক্রিয়া উত্তম। কাসাভার জন্য কলম্বিয়াতে ফিল্ড জিন ব্যাংক রয়েছে।

৪। **ইন ভিট্রো উপায়-** ইন ভিট্রো উপায়ে ল্যাবরেটরিতে Recalcitrant প্রজাতির ক্যালাস টিস্যু সংরক্ষণ করা হয় বা তরল আবাদ মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যায়। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে Cryogenic পদ্ধতিতেও (-১৯৬° সে.) এদেরকে সংরক্ষণ করা যায়। তবে এতে সময়, খরচ ও অধিক সতর্কতার দরকার হয়।

৫। **ডিএনএ সংরক্ষণ-** উদ্ভিদ হতে ডিএনএ সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করা হয়। ডিএনএ সংরক্ষণের মাধ্যমে দরকারী ও কাঙ্ক্ষিত জিন সংরক্ষণ করা যায় কিন্তু এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত ডিএনএ হতে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবিত হয়নি।

৬। **পরাগরেণু সংরক্ষণ-** পরাগরেণুকে নিম্ন তাপমাত্রায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং পরে জীবন্ত উদ্ভিদের সাথে ক্রসিং এ ব্যবহার করা হয়। সংরক্ষিত পরাগ হতে অদূর ভবিষ্যতে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি করা যাবে বলে আশা করা যায়। পরাগ সংরক্ষণের মাধ্যমে কেবল উদ্ভিদের পুরুষ দিকটি সংরক্ষিত হয়, স্ত্রী দিকটি নয়।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব : প্রাকৃতিক উপায়ে একদিকে যেমন জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে অপরদিকে তেমন ধ্বংস হচ্ছে। তবে গত কয়েক শতাব্দী থেকে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের হার সৃষ্টির থেকে অনেকগুণ বেশি। এর প্রধান কারণ মানুষের কর্মকান্ড। বন ধ্বংস ও জলাশয় ভরাট করে কৃষিজমি সম্প্রসারণ, অধিক ফলনের জন্য রাসায়নিক সার, আগাছা নাশক, কীটপতঙ্গ নাশক, ছত্রাক নাশক প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য অধিকহারে বনাঞ্চল ধ্বংস ও মাত্রাতিরিক্ত বনজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক বনভূমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। প্রাণীকূল তার খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য সরাসরি উদ্ভিদকুলের উপর নির্ভরশীল থাকায় ও জলাভূমি হ্রাসের সাথে সাথে বহু প্রাণী প্রজাতিও ধ্বংস হয়েছে অথবা বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে।

জীব প্রজাতির দ্রুত হ্রাসের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা দেখা দিয়েছে এবং দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুর। ঝড়, টর্নেডো, হারিকেন, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েই চলছে। এসব কারণে মানুষের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। কাজেই মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই পৃথিবীব্যাপী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে- The **International Union for Conservation of Nature** and Natural Resources (**IUCN**), World Wide Fund For Nature (WWF), The **United Nations Environment Programme** (**UNEP**), **World Conservation Monitoring Centre** (**WCMC**), The **Convention on International Trade in Endangered Species** of Wild Fauna and Flora (**CITES**) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

নিজ দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উপর নির্ভর করার চেয়ে নিজেরাই সচেতন হব এবং অন্যদেরকে সচেতন করব। জন সাধারণকে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বোঝাতে পারলে সহজেই আমাদের এ অমূল্য সম্পদ রক্ষা করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে ভারতের হিমালয় অঞ্চলের 'চিপকো' আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। চিপকো স্থানীয় আদিবাসী শব্দ যার অর্থ হলো লেপ্টে থাকা। কোন বৃক্ষ কাটতে এলে ঐ আন্দোলনের কর্মীরা গাছের সাথে লেপ্টে থাকে, ফলে ঐ গাছটি কাটার হাত থেকে রক্ষা পায়। স্থানীয় জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আমাদেরও অবস্থা অনুযায়ী কোন উপায় বের করা উচিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে ইন সিটু ও এক্স সিটু কনজার্ভেশন এর নামগুলো লিখুন				

সারসংক্ষেপ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলতে বর্তমান জীবকুলের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিমিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার যাতে করে একদিকে বর্তমান প্রজন্ম তাদের দরকার অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা সমুন্নত থাকাকে বোঝায়। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতি মূলত দুটি। যথা- (ক) ইন সিটু কনজারভেশন এবং (খ) এক্স সিটু কনজারভেশন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতি কতটি ?

(ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪

২। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো হলো-

i. ইন সিটু কনজারভেশন ii. এক্স সিটু কনজারভেশন

iii. হোম সিটু কনজারভেশন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

ক	খ
প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম জীব সংরক্ষণ করে এবং সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে সুরক্ষা দেয়। এটি সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি পদ্ধতি	বিশেষ কিছু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু স্থান রয়েছে। এতে সরকার ছাড়াও ব্যক্তি মালিকানা রয়েছে

৩। উপরের ছকের 'ক' কি নির্দেশ করে-

(ক) জাতীয় উদ্যান (খ) বোটানিক্যাল গার্ডেন

(গ) অভয়ারণ্য (ঘ) অভয়াশ্রম

৪। চিত্রে খ দ্বারা কোনটিকে বোঝানো হয়েছে-

(ক) চিড়িয়াখানা (খ) গেম রিজার্ভ (গ) অভয়ারণ্য (ঘ) বোটানিক্যাল গার্ডেন

৫। ছকের 'ক' দ্বারা সম্ভব হলো-

i. বিনোদন ii. গবেষণা iii. শিকার

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.১০ বিলুপ্তপ্রায় জীবের সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	সচেতনতা, উদ্ভিদ সংরক্ষণ

আমাদের অসচেতনতার কারণে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে হাজার হাজার প্রজাতি। এদেরকে সংরক্ষণের বিষয়ে এখনই ব্যবস্থা না নিলে এবং এদের বিষয়ে সচেতন না হলে এরা বিলুপ্ত হয়ে কালের গহবরে হারিয়ে যাবে। আমাদের সবাইকে, সকল স্তরের মানুষকে বা সকল পেশাজীবীর মানুষকে, এমনকি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বেসরকারি ও সরকারি সবাইকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। আবার জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বুঝে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। যে সকল প্রজাতি বিলুপ্তির পথে তাদেরকে খুব দ্রুত সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে বিলুপ্তপ্রায় জীবগুলো সংরক্ষণের বিষয়ে বেশি সচেতন হতে হবে। সে সাথে রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, মৌখিক আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে অপরকেও সচেতন করে তুলতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে সংরক্ষণের ৩টি সচেতনতা উল্লেখ করুন	

সারসংক্ষেপ

আমাদের সবাইকে, সকল স্তরের মানুষকে বা সকল পেশাজীবীর মানুষকে, এমনকি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বেসরকারি ও সরকারি সবাইকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। আবার জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বুঝে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। যে সকল প্রজাতি বিলুপ্তির পথে তাদেরকে খুব দ্রুত সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে বিলুপ্তপ্রায় জীবগুলো সংরক্ষণের বিষয়ে বেশি সচেতন হতে হবে। সে সাথে রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, মৌখিক আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে অপরকেও সচেতন করে তুলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জীবপ্রজাতি সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতাগুলো হলো-

i. পারিবারিক ii. সামাজিক iii. রাজনৈতিক

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন- ১

শিক্ষক ক্লাসে পাঁচটি উদ্ভিদের নাম বললেন। তিনি আরও বললেন উদ্ভিদগুলো Red Data Book এ আছে। উদ্ভিদগুলো বিভিন্ন ইকোলজিক্যাল এবং মানবসৃষ্ট কারণে ধ্বংস হয়ে আজ বিলুপ্তির পথে। এদেরকে সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

(ক) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ফলে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নাম লিখুন।

(খ) উপকূলীয় বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত বইতে লেখা আছে এমন ৬টি উদ্ভিদের নাম লিখুন।

(ঘ) উদ্দীপকে বলা হয়েছে এমন উদ্ভিদগুলোকে সংরক্ষণের উপায়গুলো লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১ : ১। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৫ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৬ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৭ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৮ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৯ : ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। গ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১০ : ১। ঘ